BENGALI HONOURS (CC-BG-5)

প্রশ্ন ঃ চৈতন্য ভাগবতের আদিখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার পরিচয় দিন।

উঃ বাল্যল্যীলা (চতুর্থ অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বৃন্দাবনদাসের তৃতীয় অধ্যায় থেকেই শুরু। এই অধ্যায়ে আমরা নবদ্বীপে তার ষষ্ঠীপূজা, নামকরণ, প্রভুর জানুগতি, সর্পের বৃত্তান্ত, চোরদ্বয়ের বৃত্তান্ত, শচী-জগন্ননাথের নূপুর ধ্বনি শ্রবণ, তৈথিক ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপাপ্রকাশ– ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ পাই। আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত চতুর্থ অধ্যায়েই মূলতঃ শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার নানামধুর চিত্র বৃন্দাবনদাস তুলে ধরেছেন।

'হাতে খড়ি'র মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজজীবনের শিশুর বিদ্যার জগতে প্রবেশের সুনা। শুভদিনে শুভলগ্নে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিয়ে হাতে খড়ি দেওয়ার প্রথা আজও বিদ্যমান। শিশু-সন্তান এর গুরুত্ব বুঝতে পারে না। অন্যান্য খেলার মতো শিশু 'হাতেখড়ি'কেও একরকম খেলা মনে করে। অবুঝ ক্রিয়া কৌতুকে মত্ত চৈতন্যের হাতে খড়ি দেন জগন্নাথ মিশ্র। এরপরই 'দেবী কর্ণবেদ প্রসঙ্গ'। অন্যান্য শিশু যেমন এই শুভদিনে লিখতে বসে কৌতুকবোধ করে, একটি অক্ষর লিখতেই হিমসিম খায়, শ্রীচৈতন্য তার ঠিক বিপরীত। চোখে দেখেই সে সববর্ণ একের পর এক লিখে যায়। কবির ভাষায়–

''দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হই সর্ব্বমনে চায়''

চৈতন্য যে সাধারণ শিশু নয়, বাল্যলীলার এই 'হাতে খড়ি' অংশেই তার প্রমাণ কবি তুলে ধরেছেন। এরপরই কৃষ্ণের শতনাম লেখা শিক্ষা এবং রাতদিন পঠন পাঠনে মগ্ন চৈতন্য। তার প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণে যেন মধু ঝরতো। সকলেই তার সুরেলা কণ্ঠ শুনে বিমুগ্ধ। অন্যান্য শিশুর মতই চৈতন্যও পাখা মেলে আকাশে উড়তে চায় এবং পাখা না পেয়ে অঝোরে কাঁদে এবং ধুলায় গড়াগড়ি যায়। কখনও আকাশের তারা, চন্দ্রকে হাতের মুঠোয় পেতে চায়। আত্মীয় স্বজনেরা নানা কথার ছলে তাকে ভোলাতে চায়, তবু সেই অসম্ভব বায়না থামে না। কিন্তু অবাক হতে হয় শত অনুরোধ উপরোধ, স্নেহ-ভালোবাসায় যার জেদ যায় না সেই বালক গৌরাঙ্গ হরিনাম শুনেই চুপ করত। তার হরেক বায়নাও কোথায় যেন হারিয়ে যেত। চৈতন্যের সব চাঞ্চল্যের অবসান ঘটত হরিনামের পীঠস্থানে।

একদিন হরিসংকীর্তনে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস যখন মুখর, তখন চৈতন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। সবাই তার কান্না থামার জন্য শত চেষ্টা করে কিন্তু কারো কথায় কর্ণপাত না করে শুধু অঝোরে ঝরে কাঁদতেই থাকে। এটা ওটা দিতে গেলে নিমাই শুধু বলে–

''যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাই।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাই।''

সেখানে পণ্ডিত জগদীশ ও পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত একাদশীর উপবাস করে আছেন। তাঁদের শুদ্ধ চিত্তের নৈবেদ্য সবাই যদি খায় তবেই তার অশান্ত হৃদয় হবে শান্ত। সবাই একাদশীর নৈবেদ্য এনে দেবার কথা বলেন। এরপর দুই পবিত্র ব্রাহ্মণ-শিশুর কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তাঁর এই শিশুর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আছেন এই অভিমত প্রকাশ করে বলেন–

'' এই শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন।।''

তাঁদের প্রদত্ত নৈবেদ্য গৌরাঙ্গ গ্রহণ করে এবং হরিধ্বনি দিয়ে ''নাচে প্রভু আপনা কীর্তনে।'' ভাবে তন্ময় হয়ে কখনো মাটিতে, কখনো কারো গায়ে, কখনো বা শচী দেবীর কোলে লুটিয়ে পড়ে। তার সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর। তারপর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে দুপুরবেলায় গৌরাঙ্গ গঙ্গার জলে স্নান করতে যায়। নদীবক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে জলকেলিতে মত্ত হয়। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে স্নানরত লোকজন দেখে নিমাই সঙ্গী সাথীসহ সাঁতার কাটছে, কখনো ডুবছে, কখনো ভাসছে। কিন্তু কেউই তাকে ধরতে পারছে না। বয়স্ক লোকেরা গৌরাঙ্গের বিরুদ্ধে জগন্নাথের কাছে নালিশ করে। অভিযোগ গৌরাঙ্গ জল ছিটিয়ে সাধুদের ধ্যান ভঙ্গ করে কারো উত্তরীয় নিয়ে পালায়, পূজার পূর্বেই প্রসাদ খেয়ে পালায়, কারো ধুতি, কারো গীত নিয়ে পালিয়ে যায়, কারো কানের ভিতর জল দেয়, কারো পিঠে চড়ে বসে, পূজোর আসনে বসে, বালি ছিটিয়ে দেয়, স্ত্রীলোকর কাপড় পুরুষের ঘাটে, আর পুরুষের কাপড় স্ত্রীলোকের ঘাটে রেখে দেয়। এককথায় গৌরাঙ্গের দস্যিপনায় ঘাটের সবলোকই অস্থির। নিমাই-এর এসব দুষ্টুমির মধ্যে চিরন্তন শিশুর সহজাত স্বভাবই প্রকাশিত। সমস্ত বালিকার দল শচী দেবীর কাছে নালিশ জানায়– গৌরাঙ্গ তাদের কাপড় চুরি করেছে, শুকনো কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে, ব্রতের ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে, চুলে ওকড়ার ফল দিয়েছে ইত্যাদি। তাদের শুধু এসব অভিযোগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলে যে শচীমাতা যদি পুত্রের এই দামালপনা বন্ধ না করেন তবে প্রচণ্ড ঝগড়া হবে বলে শাসায়। সকলের রাগ দূর করার জন্য মা প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি সন্তানকে বেঁধে রাখবেন। পিতাও পুত্রের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে গৌরাঙ্গের দেখা নেই। পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করায় শিশুগণ বলে –''আজি স্নানে না আইলা।'' ঘাটে পিতার তর্জন গর্জন শুনে নিমাই অড্য পথে পালিয়ে যায়। বাল্যলীলায় চৈতন্যের অশান্ত ব্যবহার সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন–

''নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে।'' হাতে বই নিয়ে বিশ্বম্ভর অন্যপথে বাড়ী ফিরছে। তার সর্বাঙ্গ কালিমাখা। অপূর্ব উপমার সাহায্যে কবি তা বর্ণনা করেছেন–

''লিখন কালির বিন্দু শোবে গৌর অঙ্গে।

চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে।।"

পিতা ঘরে গিয়ে নিমাইকে দেখে সস্নেহে তার বিরুদ্ধে নগরবাসীর অভিযোগের কথা বললে, নিমাই শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে–

"আজি আমি নাহি যাই স্নানে।" অন্য কেউ হয়তো খারাপ ব্যবহার করেছে। তা সত্ত্বেও পিতা অভিযোগের কথা তুললে দৃঢ় কণ্ঠে নিমাই বলে যে কিছু না করেও তাতে দুর্নামের ভাগী হতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বন্ধু-বান্ধবদের নিমাই-এর কথাবার্তা শুনে পিতা-মাতা কিছুই বুঝতে পারে না। তবে মনে মনে তাঁরা ভাবেন–

"এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ জন্মিলা মোর ঘর।।"

বেলা দুইপ্রহরে নিমাই টোলে পড়াশুনার জন্য যায়। তার পঠন-পাঠনে আগ্রহের ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির নানা চিত্র ও পাওয়া যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ে চৈতন্যের বাল্যলীলার বর্ণনার মধ্যে একদিকে যেমন আছে চিরন্তন বাস্তববাদী শিশুর মনস্তত্ত্বের নানা উপাচার, তেমনি মাঝে মাঝে রয়েছে অলৌকিক-বিস্ময়কর জগতের সন্ধান। বিশেষ করে 'হাতে খড়ি'র মুহূর্তে যা দেখে তাই লেখে, হরিনাম শুনে নাচতে থাকে ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে অলৌকিত্বের প্রকাশ আছে। বাস্তববোধ, ভাবাবোধ ও ভক্তিবাদের মিশ্রণে বাল্যলীলার এই অধ্যায়টি সমৃদ্ধ। এই বাল্যলীলার মধ্যেই তৎকালীন পারিবারিক জীবনের ছায়া সম্পাতও ঘটেছে। সহজ, সরল ভাষায়, মাঝে মাঝে অলংকারের দ্যুতিতে অধ্যায়টি মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ঃ রামায়ণের অরণ্যকান্ড অবলম্বনে অত্রিমুণির আশ্রমে মুনিপত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন অংশটি সংক্ষেপে লিখুন।

উঃ চিত্রকূট ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে রামচন্দ্র অত্রিমুনির আশ্রমে সমাদরে সম্মান পাবার পর মুনি, সীতাদেবীকে তাঁর পত্নী গৌতমীর হাতে সমর্পণ করেন। মুনি-পত্নীকে দেখে সীতার মনে হয় 'মূর্তিমতি করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।'

সীতাকে প্রাণ ঢালা আর্শীবাদ করে মুনিপত্নী তাকে মুখোমুখী বসিয়ে সস্নেহে মধুর কথা বলতে শুরু করেন।

সীতাদেবীর ভাগ্যপ্রসন্ন। পিতৃকুল ও পতিকূল উভয়ই রাজকুল। দুই বংশকেই সীতা উজ্জ্বল করেছেন। রামচন্দ্র বহু তপস্যা করে এমন স্ত্রী লাভ করেছেন। রাজ সম্পদের মোহত্যাগ করে সীতা স্বামী সঙ্গিনী হয়ে বনবাসিনী হয়েছেন। সীতার গুণগান মুনিপত্নী পঞ্চমুখে করলে, সীতা বিনয়ের সঙ্গে বলেন–

"ধন জন সম্পদ না চাহি ভগবতী।
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি।।"

স্বামী ভক্তির পরম নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করে মুনিপত্নী আনন্দে আত্মহারা। তিনি সযত্নে তাঁকে নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে আদরে আলিঙ্গন করে সীতাকে তাঁর পূর্ব জীবনের ঘটনা বলতে বলেন। সীতা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত তুলে ধরেন।

স্বর্গের অপ্সরা মেনকা আকাশপথে যাবার সময়ে তার বস্ত্র উড়ে যায়। তার দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে জনক রাজার কামনাবহ্নি জ্বলে ওঠে এবং তার বীর্যের স্খলন হয়। সেই বীর্য মাটিতে পড়ে এবং তা থেকেই সীতার জন্ম। জমি চাষের সময় লাঙ্গলের ফলায় সীতার দেহ সূর্যের আলোতে আসে। নিজের কন্যা অনুমান করে জনক রাজা তাকে কোলে স্থান দেন। এমন সময় আকাশে দৈববাণী হয়। এই দৈববাণীতে সীতার জন্ম কাহিনী পিতা জানতে পারেন। লাঙ্গলের মুখে জন্ম বলে নাম রাখলেন সীতা। আনন্দে আত্মহারা রাজা দীন-দুঃখীদের অকাতলে ধন দান করেন। রাজমাতার স্নেহে সীতা বড় হন। যে শিবের ধনুকে গুণ পরাতে পারবে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন বলে মনে মনে স্থির করেন। রাজার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। জনকরাজা দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। এমন সময় রাম-লক্ষ্মণের উপস্থিতি। শ্রীরামচন্দ্র বাম হাতে ধনুক তুলে তাতে গুণ পরাতে গেলে শিবধনুক ভেঙ্গে যায়। ধনুক ভাঙ্গার শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপরই মহাধূমধামের মধ্য দিয়ে রাম-সীতা ও কুশধ্বজের দুই মেয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণ ও ভরতের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইভাবে পূর্বকথা শেষ কবে বিনয় নম্রভাবে সীতা বলেন–

"ভগবতী পূর্বকথা এই কহিলাম।
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম।"

সীতার কথায় পরিতৃপ্ত হয়ে মুনিপত্নী সীতার সিঁথিতে সিঁদুর দেন আর তার সর্বাঙ্গে মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরিয়ে নববেশে নবরূপে সাজিয়ে দেন।

সীতা ও মুনি পত্নীর কথোপকথনে আমরা অত্যন্ত আপনজনের হৃদি বিনিময় দেখি। রাজদুহিতা রাজপত্নীর বনবাসিনী মূর্তি গুরু পত্নীকে ব্যথা দেয়–এজন্যই তিনি তাকে অলঙ্কারাদি দিয়ে সাজিয়েছেন। প্রথম দর্শনেই মুনি পত্নীকে।

সীতার করুণারূপিনী মনে হওয়ায় প্রাণ খুলে তিনি তাঁর পূর্ণ জীবনের ইতিবৃত্ত বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। সীতার বনবাসিনী রূপ দেখে মুনিপত্নীর কথায় বেদনা প্রকাশ পেলে সীতা তার পতিভক্তির প্লাবনধারায় সে বেদনা দূর করে দেন। উভয়ের কথোপথন যেমন আন্তরিক তেমনি হৃদিরসে জারিত।

BENGALI HONOURS (CC-BG-5)

প্রশ্ন ঃ 'চৈতন্যভাগবত' -এর আদিখন্ডের নবদ্বীপ বর্ণনায় বাংলার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতি যে রূপ ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

উঃ বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বাংলা ভাষায় রপচিত প্রথম চৈতন্য জীবনীকাব্য। কাব্যটি তিনটি খন্ডে ও একান্নটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। বাংলা দেশে চৈতন্যদেব সম্পর্কিত যে সমস্ত কাহিনি ও তথ্য প্রচারিত হয়েছে, তার অধিকাংশই এই গ্রন্থ পাওয়া যায়। এ যেন চৈতন্যদেবের জীবনকথার আকরগ্রন্থ। কবি কাব্যটির আদিখন্ডে নবদ্বীপ ধামের সামাজিক অবস্থা জীবন্তরূপে অঙ্কন করেছেন। এই খন্ডে, চৈতন্যেদেবের বাল্যলীলার পাশাপাশি নবদ্বীপের বর্ণনা এবং তৎ-সম্পর্কিত বাংলার ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সুন্দর পরিচয় মেলে।

নবদ্বীপের পাশা দিয়েপ্রবাহিত হয়েছে পুণ্যসলিলা গঙ্গা। তার ঘাটগুলিতে লক্ষ লক্ষ স্নানার্থী পুর্ণ অর্জনে ভিড় জমায়। আবাল-বৃদ্ধবণিতা, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ সমস্ত সামাজিক, ধর্মীয় বাধা অধিক্রম করে গঙ্গা বক্ষে অবগারনের মাধমে দেহ-মনকে পবিত্র করে। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সস্নেহ দৃষ্টিপাত ঘটেছে নবদ্বীপে। ফলে এখানে বহু মহাপন্ডিতের সমাবশে লক্ষ করা গেছে। একই সঙ্গে বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। নবদ্বীপের উজ্জ্বল চিত্র আঁকতে গিয়ে কবি বলেছেন–

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সভার মিলন।।

শ্রীবাস পন্ডিত, শ্রীরাম পন্ডিত, চন্দ্রশের দেব প্রমুখ জ্ঞানীগুনীর পাশাাপশি ভবরোগবৈদ্য, শ্রীমুরারীও এখানে বাস করতেন। চট্টচগ্রাম থেকে চৈতন্যবল্লভ দত্ত যেমন আসন, তেমনি বুড়ন থেকে হাজির হন ভক্ত হরিদাস। রাঢ় অঞ্চলের এক গ্রাম থেকে আসেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, নবদ্বীপে অবতাররূপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটবে–সেই ধ্যান-ধারণকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপে জড়ো হয়েছিলেন পন্ডিতগণ–

'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।।

প্রাক্-চৈতন্যযুগে নবদ্বীপে ধর্মকর্ম ছিল, কিন্তু ভক্তিরসের ধারা তখনও প্রবাহিত হয়নি। মঙ্গলাচন্ডীর গান নবদ্বীপকে মুখরিত করে রাখত। কেউ কেউ আবার বিষহরির পূজাও করত, এইসব পূজাপার্বন বহু অর্ত, বয়ে দেব -দেবীর নানা প্রতিমা নির্মিত হত। বিষয়বাসানপূর্ণ মানুষেরা ভক্তিহীন ভাবে জীবন যাপন করত। শাস্ত্র অধ্যয়ন একমাত্র কম ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন বা যুগধর্ম ব্যাখ্যান তখন নবদ্বীপে অনুপস্থিত। যেসব পন্ডিত গীতা-ভাগবত পাঠ করতেন তাঁরা শুধু রসশূন্য তত্বকথাই শোনাতেন। তাঁদের ব্যাখায় বিন্দুমাত্র ভক্তিরস ছিল না। তৎকালীন নবদ্বীপের সংসার জীবন ছিল ভক্তিহীন। তবে ভক্তিরস পিপাসু মানুষগুলি মনে মনে দুঃখ ভোগ করতেন। নবদ্বীপবাসী যখন বিষয বাসনা সুখে মগ্ন ঠিক সেই মুহূর্তের বৈষ্ণব সমাজের অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব। তিনিই প্রথম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তিকে যুক্ত করে 'কৃষ্ণপদ ভক্তিসার' তত্তটি প্রচার করেন।

'অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য।।
জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতকর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর।।
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্বদা বাখানে কৃষ্ণপদ ভক্তিসার।।'

তৎকালীন যুগে মদ-মাংস সহযোগে যজ্ঞ পূজাও হত। কেউ বা নানা উপাচারে বাশুলী দেবীর পূজা করত। কেউ কৃষ্ণনাম শুনতে চাইত না। নবদ্বীপবাসীর উদ্ধার চিন্তায় অদ্বৈত মহাপ্রভু গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে সংকীর্তনের মাধ্যমে মৃতপ্রায় জীবনে ভক্তিরসের প্রাণবন্যা আনতে চাইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে চৈতন্যদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীবাসের মন্দিরে স্থাপিত হয় 'চৈতন্য বিলাস'। অদ্বৈত ভাইদের নিয়ে কৃষ্ণনাম শুরু করেন। এরপর একে একে চন্দ্রশেখর, গোপীনাথ মুরারী গুপ্ত, প্রমুখ ব্যক্তিবগ্য যোগদান করেন। একদিকে শুরু হয় সংকীর্তন অন্যদিকে পাষন্ডের দল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করেন।

'কিছু নাহি জানে লোকে ধনপুত্ররসে।
সকল পাষন্ড মেলি বৈষ্ণবের হাসে।।'

শেষ পর্যন্ত শ্রীবাস নিজের ঘরে বসে শ্রীকৃষ্ণ নাম করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু সংকটাপন্ন হয়েও বলে ওঠেন–

'শোনো শ্রীনবাস, গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব নয়ন গোচর।।'

এই পরম ভক্তগণ নবদ্বীপ ধাম ঘুরে ঘুরে ভক্তির প্রচার করেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তাঁরা এগিয়ে যান। তারপর নিত্যানন্দের আবির্ভাব। তাঁর আগমনে নবদ্বীপ ধান ভক্তিরসে আরও প্লাবিত হয়। এই প্লাবন ধারার মধ্য দিয়েই শচীমাতার গর্ভে শ্রীচৈতন্যের জন্ম–

'অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন।'

আবার তৎকালীন সমাজের জাত-পাত, শৈব-বৈষ্ণব, হিন্দু-মুসমলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির কোনো সুর ছিল না। ব্রাহ্মণ্য সমাজশাসিত হিন্দুধর্মের অবহেলিত নিম্নশ্রেণির মানুষের ওপর চলত অত্যাচার। এর ফলে অনেক হিন্দু মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে। সমাজের

এই কুৎসিৎ অভিঘাতের মধ্যে প্রেমধর্ম বিতরণে ঐক্য স্থাপনের জন্যই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, শুভদিনে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, ধান দুর্বা দিয়ে নবজাত শিশুর 'চিরায়ু' কামনা, হাতে খড়ি দেওয়ার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমাজ ও পারিবারিক জীবনকে মধুর করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ঃ কৃত্তিবাসের অরণ্যকান্ডের শেষ অংশে রামচন্দ্রের ভূমিকা ।

উঃ বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণকে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। যা বাঙালির হৃদয়রসে জারিত। সপ্তকান্ড রামায়ণের তৃতীয় খন্ডের নাম 'অরণ্যকান্ড'। এই কান্ডটি গহন অরণ্যের প্রতিকূল -অনুকূল পরিবেশে রামচন্দ্রের কর্মকান্ড, প্রকৃতি বর্ণনা, মিলন -বিরহ ইত্যাদি নানা চিত্রে পরিপূর্ণ। তবে 'অরণকান্ড'-এর মধ্যে বেশকিছু বিশেষ ঘটনাবলি আমরা পেয়ে থাকি। যেমন– অত্রিমুনির আশ্রমে মুনিপত্নীর সঙ্গে সীতার কথোপকথন, অগ্যস্ত মুণির উপদেশ, রাবণের প্রতি মারীচের সুমন্ত্রমা দান, শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ ইত্যাদি।

কৃত্তিবাসের 'অরণ্যকান্ড'-এর মধ্যে অংশটি শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ ও সীতার অন্বেষণ রূপে চিহ্নিত, যা আমাদের আলোচ্য বিষয়। বনভূমি আলোকোজ্জ্বল করে স্বর্ণমৃগরূপী মারীচ রম সীতার সামনে হাজির। রাক্ষস বংশ ধ্বংস করতে দেবতাদের বিপদ থেকে রক্ষার জন্যই যেন বিধাতার নির্দেশেই এই স্বর্ণমৃগের নির্মাণ সীতা এই হরিণের সোনার চর্মে উববেশনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। শ্রীরামচন্দ্র সীতার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য মৃগ হত্যায় বের হন। মারীচ রামচন্দ্রের সঙ্গে বনের মধ্যে লুকোচুরি খেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রামের ঐষিক বিশিষ্ট বাণে মারীচন আহত মারীচ মৃত্যুর আগে রামের কণ্ঠসব্র নকল করে লক্ষ্মণকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য আতনাদ করে মৃত্যুবরণ করেন। রামচন্দ্র সমগ্র ছলনা বুঝতে পেরে কুটিরের দিকে দ্রুত গমন করেন। পথে অমঙ্গলের বহু চিহ্ন তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। মারীচের রামকণ্ঠের আহ্বানে লক্ষ্মণ কি সীতাকে একাকিনী রেখে বনে আসবে–এই প্রশ্নে রামের হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে। আরও নানা প্রশ্নে তিনি যখন চিন্তাগ্রস্ত তখনই পথে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তাকে দেখামাত্র রামচন্দ্রের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তাঁর কণ্ঠে বিপদের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে–

'মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই।
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ পাব নহি।।'

সেই সময়ই লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের সীতা হারানোর ভয়ে বক্ষভেদী বিলাপ শোনা গেছে–

'শুনরে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতুলি
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি।।'

রাক্ষস পরিবৃত এই গভীর অরণ্যে মুনি ঋষিগণ সর্বদই শঙ্কাতুর লক্ষণ সব জেনে শুনেও যে কাজ করেছে তার ভবিতব্য ভেবে রামচন্দ্র নিজের অদৃষ্টকেই বারবার দোষারোপ করতে থাকেন। মারীচ বধের দৃশ্য দেখিয়ে ভাইকে নিয়ে তিনি দ্রুত কুটিরের উদ্দেশ্যে গমন করেন। কুটির দ্বারে পৌঁছে তাঁর বুক ফাটা 'সীতা-সীতা' ডাক সত্যিই বিরহের তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কোনো উত্তর না পেয়ে এবং কুটির সীতাশন্য দেখে তিনি মূচ্ছিতাপ্রায় হয়ে হয়ে পড়েন। সীতা ছাড়া রামচন্দ্র নিজেকে কল্পনা করতে পারছেন না। সীতাকে না পেলে প্রাণত্যাগ করবে বলেও বিলাপ করতে থাকেন। বন-গুহা, তুরুমূল তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেও সীতাকে খুঁজে পেলেন না। সীতা শোকে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন এবং বুকে হাহাকার ধ্বনি জেগে ওঠে। তাঁর কান্নায় অরণ্যজগৎ, পশু-পাখিরাও সমব্যথী হয়ে পড়ে, কেঁদে ওঠে। সীতার শোকে রাম বিচলিত হয়ে পড়েন, তবু আশায় বুক বেঁধে লক্ষ্মণকে মুনি পত্নীর কাছে, গোদাবরী নদীর তীরে খুঁজতে বলেন। তিনি এতটাই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন তা নিম্নোক্ত উক্তিতেই স্পষ্ট হয়ে যায়–

'সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সাতী ছাড়া আমি যেন মণিহরা ফণি।"

সাপ যেমন তার মাথার মূল্যবান মণি হারিয়ে বিবরে লুকিয়ে কাঁদে, তেমনি রামচন্দ্র তাঁর প্রাণপ্রিয়া সীতাকে হারিয়ে বেদনাক্লিষ্ট অশ্রুসিক্ত। ভাই লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর সেই হাহাকার ধ্বনি–

'দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।।'

কর্মযোগী রামচন্দ্র অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছেন। পত্নীপ্রেমের অনন্তরূপ তাঁর আদর্শ পতিসত্তাকে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সীতাকে না পেয়ে পাগল-পারা হয়েছেন। তাঁর প্রেম ভীরু কোমল-মধুর রূপটি কৃত্তিবাসহ করুণরসের ধারায় স্নাত করে সার্থক প্রেমিকরূপে সৃষ্টি করেছেন। তবে চোখের জ্বলে বুক ভাসিয়ে ক্ষান্নত না থেকে তিনি সীতা উদ্ধারের জন্য মন-প্রাণ দৃঢ় করে অগ্রসর হয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ 'রাধাবিরহ' অংশ কি প্রক্ষিপ্ত ?

উঃ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের মোট তেরোটি খণ্ডের মধ্যে এক থেকে বারো অংশ বিভিন্ন নামের সঙ্গে 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত আছে। একমাত্র 'রাধা-বিরহ' অংশে এই শব্দটি নেই। এছাড়াও আরো কিছু কিছু তথ্য থেকে এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত বলে প্রথম সংশয় প্রকাশ করেন– যোগেশচন্দ্র রায়

বিদ্যানিধি। তাঁর মতে '.....বড়ু বাসলী যে সব ভণিতায় নেই, সেইপদগুলি প্রক্ষিপ্ত।' পরবর্তীকালে বিমানবিহারী মজুমদার 'রাধা-বিরহ' অংশকে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তিগুলি হল–

১। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ১২টি অংশে 'খণ্ড' শব্দ থাকলেও শেষ অংশটিতে 'খণ্ড' শব্দ নেই।

২। পূর্বের ১২টি খণ্ডে বড়াইর যে ভূমিকা ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, 'রাধা-বিরহ' অংশে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগাগোড়া কৃষ্ণের দূতী হয়ে কাজ করেছে বড়াই। অর্থাৎ কুট্টনীর ভূমিকা নিয়েছে। কিন্তু শেষ খণ্ডে রাধার প্রতি মমতাময়ী রূপে ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই অংশ বড়াই যেন কৃষ্ণকে চেনেই না।

৩। 'রাধা-বিরহে'র পূর্বে অন্তত ৫ বার রাধা-কৃষ্ণের রতিসম্ভোগ ঘটেছে। শেষ অংশে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই।

৪। ভাষাগত দিক থেকেও পার্থক্য আছে। শেষ অংশের ভাষা পূর্বের অংশগুলির ভাষার চেয়ে আধুনিক।

৫। পটভূমিকার দিক থেকেও কোনো মিন নেই।

৬। 'রাধা-বিরহের'র ৮টি ভণিতায় যা আছে তা পূর্ব খণ্ডগুলির ভণিতায় নেই। যেমন 'বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।'

এই মতের সমালোচনা ঃ লিপিকরের ভুলবশত 'খণ্ড' শব্দটি যুক্ত নাও হতে পারে। কৃষ্ণকে বড়াই মোটেই চেনেনি–এ যুক্তি মানা যায় না। কারণ 'রাধা-বিরহ' অংশে বড়াইর নির্দেশেই রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করেছে। কবি হয়তো শ্রোতাদের কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতেই এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। বড়াইর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বড়াইর চরিত্রের মূল রূপ শেষ অংশেও বজায় আছে আর তার স্নেহশালিনী রূপের উদ্বোধন ঘটেছে, 'বংশী খণ্ডে'ই। পাঁচবার রাধাকৃষ্ণের মিলনের ব্যাপারটি বড়াই গোপন রাখতে বলেছিল। তাছাড়া এই অসামাজিক মিলনের গোপনীয়তা মনস্তত্ত্বসম্মত। ভাষাগত বিচারেও অভিযোগ মেনে নেওয়া যায় না। 'রাধা-বিরহ' অংশের ভাব ও সুর, হৃদয়-আর্তির সঙ্গে যুক্ত। যার ফলে এই অংশের ভাষায় ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। বিষয় ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেই ভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু 'ভণিতা'কে অবলম্বন করে অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলা ঠিক নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কাব্য গঠনের দিক থেকে, স্থান-কালের পারম্পর্য বিচারে, বয়স অনুসারে রাধার চিন্তা-চেতনার অগ্রগতি লক্ষ্য করে, চরিত্রের ক্রমপরিণতির বিচারে এবং কবির ক্রমবিকশিত প্রতিভার স্তর উপলব্ধি করে আমরা বলতে পারি 'রাধা-বিরহ' অংশটি প্রক্ষিপ্ত নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি বিচার করলে দেখা যায় কাহিনী, আঙ্গিক, চরিত্র, ভাব-ভাষা সবদিক থেকেই শেষ অংশটির সঙ্গে অন্যান্য খণ্ডের গভীর যোগসূত্র আছে। রাধা চরিত্রের ক্রমপরিণতিদানেও এই অংশের প্রয়োজন ছিল। 'বংশীখণ্ডে' কাব্যের সমাপ্তি ঘটলে কাব্য কাহিনী খণ্ডিত হতো এবং রাধাকেও অসম্পূর্ণভাবে পাঠক পেতো।

প্রশ্ন ঃ কৃত্তিবাসের কাব্যে জটায়ুর সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের বর্ণনা করুন।

উঃ আকাশপথে সীতাকে হরণ করে রাবণ যখন রথেই লঙ্কাপুরীর দিকে ধাবিত তখন সীতার বক্ষভেদী আর্তিতে আকাশ বাতাস বেদনায় ম্লান। রাবণের রথ যখন দ্রুতগতিতে ধাবিত ঠিক সেই সময় 'গরুড় নন্দন' জটায়ু সীতার বুক ভাঙা কান্না শুনে আকাশে উড়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তারপর রাবণের রথকে চিনতে পেরে জটায়ু–

''দুই পাখা প্রসারিয়া আগুলিল বাট।
রাবণের গালি দিয়া মারে পাখসাট।।''

তার পাখার ঝাপটানিতে রাবণ দিশেহারা। জটায়ু পাখী সীতা হরণের অপরাধের জন্য রাবণকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালি দেয় এবং তীব্র ঘৃণায় বলে–

''কি কব হয়েছি বৃদ্ধ ঠোঁট হৈল ভোঁতা।
নতুবা ফলের মত ছিঁড়িতাম মাথা।।''

একদিকে পাখার আঘাত অন্যদিকে গালা-গালি দিয়ে রাবণকে জর্জরিত করে। তুমুল যুদ্ধ চলে। জটায়ু ছোঁ মেরে রাবণের পিঠের মাংস খুবলে নেয়। নখের আঁচড়ে ও ঠোঁটের কামড়ে রাবণের রথ ভেঙে যায়। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দ্বারা সে সারথির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও রণধ্বজা টুকুরো টুকরো হয়। ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ নিরুপায় হয়ে সীতাকে ভূমিতে রেখে আকাশে উঠে। জটায়ু শ্রান্ত-ক্লান্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। সেই দেখে রাবণ ভগ্ন রথকে আবার নূতন করে সাজায় এবং সীতাকে পুনরায় রথে তুলে নেয়। তা দেখে জটায়ু দ্বিতীয়বার রাবণের সঙ্গে 'মহাযুদ্ধে' লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধ ভয়ংকর। পরের জনন্য জটায়ু কেন প্রাণ দিচ্ছে–একথা বলে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করলে ঘোর যুদ্ধ বেধে যায়। জটায়ু ঠোঁট দিয়ে রাবণের রাজমুকুট খান খান করে, তার মাথার চুল উপড়ে নেয়। এতে–

''নিষ্কেশ হইল রাবণের দশমুন্ড''।

রাবণ জটায়ুর উদ্দেশ্যে বত্রিশ হাজার বাণ নিক্ষেপ করে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তবু সে প্রাণপণে লড়াই চালিয়ে যায়। রামচন্দ্রের জন্য সাহসে ভর করে জটায়ুর লড়াই স্মরণীয়। রাবণ 'অর্ধচন্দ্রবাণে' তার দু'পাখা কেটে ফেলে। জটায়ু মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তার ব্যথায় সীতা ব্যথিত আর রামচন্দ্রের ভয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত রাবণ তড়িঘড়ি রথ নিয়ে লঙ্কার দিকে যাত্রা করে।